একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Gambhira: Alternative media and the voice of democracy in folk culture commentary

গম্ভীরা: লোকসংস্কৃতির ভাষ্যে বিকল্প গণমাধ্যম ও গণতন্ত্রের স্বর

Name of the Author: **Lakshmikanta Karmakar**

Affiliation: **Guest lecturer, Gour Mahavidyalaya, Malda; Research Scholar, St. Xavier's College (Autonomous), Kolkata**

Abstract: At a time when media freedom is increasingly under threat—India ranking 151 out of 180 countries in the World Press Freedom Index 2025, and mainstream news organizations increasingly constrained by political, corporate, and market pressures—the question arises: who speaks for the marginalized? This paper argues that the answer may lie not in mainstream or corporate media, but in the folk theatres of rural Bengal. Gambhira, a centuries-old performance tradition from Malda, is conventionally studied as ritual theatre centered on Shiva. This paper, however, reads Gambhira as a living, counter-media practice. Moving beyond folklorist nostalgia, Gambhira blends ritual, masked performance, improvisation, satire, and participatory dialogue to engage critically with pressing social issues—environmental crisis, communal discrimination, unemployment, lack of education, inadequate healthcare, gender violence, and women's rights. At its center stands 'Nana'—a localized, fallible Shiva who transcends caste, religion, and community hierarchies to listen to problems and guide solutions. Gambhira is thus not merely entertainment; it functions as a democratic forum, raising awareness and fostering collective conscience among the community. In the twenty-first century, where social media algorithms and corporate news often mediate public discourse and suppress inconvenient truths, Gambhira provides a participatory space for truth-telling, critique, and reflection. By articulating the experiences of the marginalized and exposing systemic inequities, it operates as an indigenous counter-public sphere—a folk theatre that is simultaneously cultural performance, civic pedagogy, and alternative media. This paper situates Gambhira within performance studies, critical media theory, and subaltern discourse, arguing that folk theatre can serve as a robust instrument of democracy. As mainstream media falters under political and economic pressures, Gambhira's vibrant practices demonstrate how traditional cultural forms can sustain public debate, nurture civic awareness, and amplify the voices of those often rendered invisible.

Keywords: Gambhira, Folk Culture, Voice of Democracy, Media, Nana, Malda.

গম্ভীরা: লোকসংস্কৃতির ভাষ্যে বিকল্প গণমাধ্যম ও গণতন্ত্রের স্বর

লক্ষ্মীকান্ত কর্মকার

বিজ্ঞান ও ধর্মের মৌলিক পার্থক্য এই যে — বিজ্ঞান ক্রমাগত নিজেকে অস্বীকার করে, পুরোনো ধারণাকে ভেঙে, নতুন আবিষ্কারের পথে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলে; যেন নিজের কাঠামো ভেঙে চূড়ান্ত সত্যের সন্ধানে এক অন্তহীন অভিযাত্রা। ধর্ম, প্রাচীন বিশ্বাসে প্রোথিত, সচরাচর সেই পথে হাঁটে না। যদিও লোকসংস্কৃতির উৎস কেবল ধর্মে সীমাবদ্ধ নয়, তবু এর শিকড় অনেক সময়েই প্রাচীন বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানে প্রোথিত থাকে। কিন্তু মালদার লোকসংস্কৃতির এক প্রধান শাখা—লোকনাটক "গম্ভীরা"—সেই প্রথাগত পথ থেকে খানিকটা সরে, এক অভিনব ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। এটি নিজেকে শুধুমাত্র প্রাচীন বিশ্বাসে আবদ্ধ রাখে না, ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার বেড়াজালে ঘুরপাক খায় না; বরং সমাজের আধুনিকীকরণের ভার কাঁধে তুলে নিয়ে মানুষের স্বপ্নভঙ্গের অনুভূতিগুলিকে নাড়াচাড়া করে। তাই গম্ভীরাকে কেবল লোকনাটক বা উৎসব হিসেবে দেখলে চলবে না; বরং এটি হয়ে উঠেছে বিকল্প গণমাধ্যমের এক শক্তিশালী কণ্ঠস্বর।

মালদার অলিগলি, গ্রামাঞ্চল ও মেলার প্রাঙ্গণে গম্ভীরার সঙ্গে মিশে থাকে নানা আচার, মুখোশ নাচ, চরক, মূকাভিনয়—এক বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের সম্মিলন। কিন্তু এই বাহ্যিক উচ্ছ্বাসের ভেতরে লুকিয়ে থাকে প্রতিবাদী চেতনা, নিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক সত্যপ্রেম। গম্ভীরার আখ্যান কাঠামোতে ‘নানা’ চরিত্রটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—হিন্দুদের শিব হলেও এখানে তিনি হয়ে ওঠেন জাতি-ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে এক অভিভাবক, যিনি সমাজের অসংগতি শোনেন, প্রশ্ন তোলেন এবং সমাধানের পথ খোঁজেন। ফলে গম্ভীরা মানুষের ক্ষোভ ও স্বপ্নভঙ্গের অনুভূতিকে কণ্ঠ দেয়, আবার একইসঙ্গে গণতন্ত্রের মঞ্চে বিকল্প যোগাযোগের ভূমিকা পালন করে।

আজকের একবিংশ শতকে এই প্রাসঙ্গিকতা আরও তীব্র। তথ্যপ্রবাহ যত বেড়েছে, ততই সত্য বলার ক্ষেত্র সংকুচিত হয়েছে। মূলধারার সংবাদমাধ্যম রাজনৈতিক প্রভাব ও কর্পোরেট স্বার্থে ক্রমশ বন্দি হয়ে পড়েছে। Reporters Without Borders-এর World Press Freedom Index 2025 অনুযায়ী ভারত ১৮০ দেশের মধ্যে ১৫১তম স্থানে, যা অত্যন্ত গুরুতর হিসেবে ধরা হয়; যদিও ২০২৪ সালে তা ছিল ১৫৯তম। অন্যদিকে V-Dem Institute ভারতে গণতন্ত্রকে ‘electoral autocracy’ আখ্যা দিয়েছে, আর Freedom House ২০২৪ সালে ভারতকে ‘partly free’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এসব তথ্য প্রমাণ করে, গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ গণমাধ্যম আজ গভীর সংকটে।

এই প্রেক্ষাপটে গম্ভীরা হয়ে ওঠে একটি বিকল্প কণ্ঠস্বর। যেখানে প্রচলিত সংবাদমাধ্যম প্রান্তিক মানুষের কথা তুলে ধরতে ব্যর্থ, সেখানে গম্ভীরা ব্যাঙ্গকৌতুক, কৌতুক ও নাট্যময় সংলাপের মাধ্যমে সমাজের গভীরতম

সত্য প্রকাশ করে। এটি নিছক হাস্যকৌতুক নয়, বরং একধরনের সামাজিক আন্দোলন, জনমত গঠন ও গণতান্ত্রিক চেতনার রক্ষাকবচ।

গম্ভীরার উৎস ও বিকাশকে বোঝার জন্য আমাদের ফিরে যেতে হয় বাংলার লোকবিশ্বাস ও লোকাচারের গভীরে। প্রচলিত মতে গম্ভীরা প্রথমে ছিল শিব-পূজার সঙ্গে যুক্ত এক আচার। মালদা ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে চৈত্রসংক্রান্তির সময় শিবপূজার আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠিত হত গম্ভীরার প্রাচীনতম রূপ। সেই সময় গ্রাম্যসমাজে শিবকে কেন্দ্র করে যে মঙ্গলকামনা উৎসব গড়ে উঠেছিল, গম্ভীরার মূল শিকড় সেই আচারেই প্রোথিত। তবে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে:

"উৎসবটি এখন শিবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলে শৈব ধর্ম প্রসারের পূর্বেও এই উৎসব এই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, তখন তা সূর্যোৎসব বলে পরিচিত ছিল। চৈত্র সংক্রান্তির সময় যখন সূর্যের একটি সাংবাৎসরিক উল্লেখযোগ্য 'অয়ন' হয়ে থাকে তখনই এই উৎসবের সময়, সুতরাং তা সূর্যেরই উৎসব, অন্য কোনও দেবদেবীর নয়। উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে শৈব ধর্মের উত্থান হয়েছিল, সেইজন্য এই উৎসব তখন থেকেই শিবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।"

শিব এখানে শুধু পূজিত দেবতা নন, তিনি ছিলেন গ্রামীণ মানুষের দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগের শ্রোতা। কৃষকের জীবনযাত্রা, বঞ্চনা, রোগব্যাধি বা দুর্ভিক্ষের শিকার হওয়া—সবই এক ধরনের লোকসংলাপের মাধ্যমে শিবের উদ্দেশে নিবেদন করা হতো।

এই প্রাথমিক পর্যায়ে গম্ভীরা ছিল মূলত ধর্মীয় এবং আচারধর্মী। এখানে বিনোদনের চেয়ে ভক্তিরসই বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল। কিন্তু লোকসংস্কৃতির এই অনন্য ধারা গম্ভীরা দীর্ঘদিন কেবল পূজা বা রীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; মানুষের জীবনযাত্রা ও সমাজ-অর্থনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেটি রূপান্তরিত হয়। গম্ভীরার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি আচারধর্মী পূজা থেকে সরে এসে ক্রমে এক ধরনের পালাগানের আকার নেয়।

এই পরিবর্তনের পেছনে কয়েকটি প্রধান কারণ লক্ষ করা যায়। প্রথমত, শিবপূজার সময়ে প্রচুর লোক সমাগম ঘটত। ধর্মীয় আচারকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে এক ধরনের আনন্দোৎসবের পরিবেশ তৈরি হতো। পূজার আনুষ্ঠানিকতার পাশাপাশি সেখানে প্রয়োজন ছিল বিনোদনেরও। দ্বিতীয়ত, গ্রামীণ জীবনে গান ও নাট্যরূপের একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল, যা গম্ভীরার মধ্যে প্রবাহিত হতে শুরু করে। পূজার আসরে বসে শিবকে উদ্দেশ করে যে আরাধনামূলক সংলাপ বলা হতো, তা ধীরে ধীরে নাটকীয় ভঙ্গি লাভ করে। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র ধারণ করে শিবের সঙ্গে কথোপকথনের অভিনয় করতে শুরু করে। এই অভিনয়ভিত্তিক সংলাপই পরবর্তীকালে গম্ভীরাকে পালাগানের পর্যায়ে পৌঁছে দেয়।

এই পালাগানধর্মী রূপে গম্ভীরা ক্রমশ সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠতে থাকে। একদিকে শিব রয়ে গেলেন এক প্রতীকী দেবতা, কিন্তু অন্যদিকে তিনি ধীরে ধীরে গ্রামীণ পরিবারের কর্তা, গৃহস্থ কিংবা রাষ্ট্রশক্তির

প্রতীক হিসেবেও ব্যাখ্যাত হতে লাগলেন। গম্ভীরার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো—এখানে সংলাপের মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা, দুঃখ, বেদনা, আনন্দ কিংবা অভাব-অভিযোগ প্রকাশিত হয়। একজন গম্ভীরা-গায়ক শিবের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে থাকেন, যে নানা। আরেকজন 'নাতি' চরিত্রে এসে সমাজজীবনের অসংখ্য অসুবিধা উত্থাপন করেন। এই 'নানা-নাতি' সংলাপ ধীরে ধীরে গম্ভীরার মুখ্য কাঠামো হয়ে ওঠে।

এই রূপান্তর থেকে বোঝা যায় যে গম্ভীরা কেবল পূজা বা ধর্মীয় আচারে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং ক্রমশ এটি গ্রামীণ মানুষের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও বোধের প্রকাশভূমি হয়ে উঠেছে। এখান থেকেই শুরু হয় গম্ভীরার দ্বিতীয় ধাপ, অর্থাৎ লোকজ নাট্যগানের বিকাশ। পালাগানের ভেতরে প্রবেশ করে ব্যাঙ্গকৌতুক, কৌতুক, সামাজিক সমস্যার প্রতিফলন, এমনকি রাজনৈতিক ইঙ্গিতও। মানুষ শিবের কাছে শুধু প্রার্থনা করে না, তার কাছে প্রশ্নও তোলে। কৃষকের অন্নাভাব, করের বোঝা, প্রশাসনিক দুর্নীতি, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, বাল্যবিবাহ, নারীপাচার, উগ্র জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা—সবই গম্ভীরার গানে রূপ পেতে থাকে।

গবেষকরা মনে করেন, এই সময় থেকে গম্ভীরা ক্রমে একটি প্রতিবাদী ও গণতান্ত্রিক চরিত্র লাভ করতে শুরু করে। কারণ এখানে দেবতা শিব আর কেবল পূজিত দেবতার আসনে নেই; তিনি পরিণত হয়েছেন এমন এক প্রতীকী সত্তায়, আর নাতির চরিত্রেও যারা অভিনয় করে তারাও প্রতীকী হয়ে ওঠে রাষ্ট্রব্যবস্থার কঙ্কালসার চিত্র তুলে ধরার জন্য। তার শতছিদ্র পোশাক পরেই পালাগানে অংশগ্রহণ করেন। ডক্টর মাযহারুল ইসলাম তরু সম্পাদিত 'হাজার বছরের গম্ভীরা' বইতে ডঃ প্রদ্যুৎ ঘোষ বলেন- "অভিনেতাদের মধ্যে একজন একেবারে ছিন্নবস্ত্রে থাকে। সে দরিদ্র জনসাধারণের প্রতিনিধি। তার বক্তব্য সবচেয়ে কৌতুকপূর্ণ, কিন্তু নিষ্ঠুর সত্যের মোড়কে ঢাকা। হাস্যকৌতুকের মাধ্যমে বক্তব্য পরিস্ফুট করে কুশীলবেরা, কিন্তু সেই হাসির অন্তরালে লুকিয়ে থাকে কঠিন সত্য। কথাগুলি লোকদের ভাবায়।"

এ চিত্র যেন সমাজের ক্ষমতাশালী স্তরের সামনে নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বর উত্থাপনের এক অভিনব কৌশল।

গম্ভীরার তৃতীয় ধাপ তাই সমাজ-সংলাপ বা গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের ধাপ। লোকসংস্কৃতির অন্যান্য ধারার মতো এটিও বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলিকে ভাষা দেয়, তবে গম্ভীরার বিশেষত্ব হলো এর নাট্যরূপী উপস্থাপনা। গান ও সংলাপের মাধ্যমে কৃষকের দুঃখ, শ্রমজীবীর বঞ্চনা, নারীজীবনের যন্ত্রণা কিংবা রাষ্ট্রীয় দুর্নীতির সমালোচনা প্রকাশ পায়। গম্ভীরার শিব-নাতি কাঠামোও আসলে ক্ষমতা ও প্রজার দ্বন্দ্বকে প্রতীকায়িত করে। শিব হচ্ছেন কর্তা—তিনি প্রশাসন, সমাজব্যবস্থা বা রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করছেন; আর নাতি হচ্ছেন সাধারণ মানুষ, যার জীবনের প্রতিদিনের সমস্যা কণ্ঠে উঠে আসছে।

এইখানেই গম্ভীরার গণতান্ত্রিক চরিত্র ফুটে ওঠে। কারণ সমাজে যেখানে বাস্তবিক অর্থে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা হয় না, সেখানে গম্ভীরা হয়ে ওঠে বিকল্প মঞ্চ। লোকসমাজে গাওয়া এই গানই হয়ে ওঠে প্রতিবাদের ভাষা, গণআকাঙ্ক্ষার প্রকাশভূমি। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের মালদায় গম্ভীরা একটি শক্তিশালী

গণমাধ্যমের কাজ করেছে। চাষির দুরবস্থা, শস্যনষ্ট, জমিদারের অত্যাচার, প্রজাশোষণ—সবকিছুই গম্ভীরার গানে উত্থাপিত হয়েছে এমন ভাষায়, যা সাধারণ মানুষ সহজেই বুঝতে পারে।

আজকের দিনে গম্ভীরার গুরুত্ব এই কারণেই অনস্বীকার্য যে, এটি আমাদের শেখায়—লোকসংস্কৃতি কখনো স্থির নয়, বরং যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়ে মানুষের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়। গম্ভীরার মূল তাৎপর্য হলো, এটি শুধু একটি লোকগান নয়, বরং এটি একটি গণতান্ত্রিক চর্চার ভুবন, যেখানে সাধারণ মানুষ নিপীড়ন ও অবিচারের বিরুদ্ধে নিজের কণ্ঠস্বর তোলে।

এইভাবে গম্ভীরার উৎস থেকে গণতান্ত্রিক রূপান্তরের যে যাত্রাপথ আমরা দেখতে পাই, তা কেবল উত্তরবঙ্গ বা মালদার ইতিহাসে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমগ্র বাংলা তথা দক্ষিণ এশিয়ার লোকসংস্কৃতির ভেতরে এক বৃহত্তর গণপ্রবণতারই প্রতিফলন। পূজা থেকে পালা, পালা থেকে প্রতিবাদ—এই তিন ধাপের মধ্য দিয়েই গম্ভীরার জীবনচক্র সম্পূর্ণ হয়।

গম্ভীরা গান অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার প্রথা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের সঙ্গে জড়িত ছিল। ‘প্রাতিমোক্ষ’ গ্রন্থে যেমন নৈতিক কার্যকলাপের মূল্যায়ন উল্লেখ করা আছে, তেমনই গম্ভীরা আসরে বছরে ঘটে যাওয়া নৈতিক ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের আলোচনা হত।

জি. ই. ল্যাম্বোর্ন-এর ১৯১৮ সালের গেজেটিয়ার অনুসারে,

"In this district, the ceremony is universal amongst low castes Hindus... and used to review at this ceremony the acts done during the year which was passing. The ceremony consisted originally in the annual review of the acts of the year and penance for misdeeds."

এখান থেকে দেখা যায় যে গম্ভীরা আচার-অনুষ্ঠান সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিবিম্ব হিসেবে কাজ করত। হরিদাস পালিতও লিখেছেন যে, বৎসরভরের দেশের বা গ্রামের গুপ্ত বা প্রকাশ্য কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে গান রচিত হত।

উদাহরণস্বরূপ, ৩১ বৈশাখ ১৩৮৮-এ দোকড়ি চৌধুরীর রচিত গম্ভীরা গানটি প্রকাশ করে রাজনৈতিক ও সামাজিক অসঙ্গতি উদ্ভাসিত হয়:

“ধাই কুড়াকুড় ধাকুর ধুকুর
গাজনের চাক বোল তোলে
শিব ঠাকুরের গোপন খবর
যাব রে ভাই বলে...।
মিউনিসিপাল অ্যাসেসমেন্ট কালে
লুটলো টাকা তলে তলে

নয়-কে বেঁধে ছয়ের হালে
আখের গোছায় দালালে...।
খোলসছাড়া এক এম পি
পাকাচুলে পরে বিয়ের টুপি
থাকলে সোলেমান সুফি
ফেলতো তাকে নাকালে..."

গানটি সামাজিক অন্যায়, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক অসঙ্গতির বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে সচেতনতা ও প্রতিবাদী মনোভাব জাগিয়ে তুলেছিল। বিশ শতকের মধ্যভাগে এই গানগুলো জাতীয় আন্দোলন ও স্বাধীনতার সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়। সরকারি নিষেধাজ্ঞা, গায়কদের গ্রেপ্তার এবং আসরে বাধা সত্ত্বেও গম্ভীরা গান জনগণের মধ্যে সজাগতা এবং প্রতিরোধের মনোভাব তৈরি করেছিল।

'জনযুদ্ধ' পত্রিকার প্রতিবেদনে মালদহের গম্ভীরা গানের সাম্রাজ্যবিরোধী বৈপ্লবিক ভূমিকা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীযুক্ত গোপাল দাসকে গম্ভীরা গানের 'যুগ প্রবর্তক' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, এবং ১৯২০ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তিনি যে অমর গম্ভীরা গান রচনা করেছিলেন, তা মানুষকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উৎসাহিত করেছিল।

গম্ভীরা গান ও অনুষ্ঠান শুধুমাত্র লোকসংস্কৃতি নয়; এটি ইতিহাস, ন্যায়বিচার, রাজনৈতিক প্রতিবাদ এবং গণতান্ত্রিক চেতনার এক স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী মাধ্যম। এ গানগুলো সামাজিক সচেতনতা, আত্মবিশ্বাস ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে এবং স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায়ে মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক মনোভাবের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

সে থেকে আজ অবধি গম্ভীরার স্বর প্রাসঙ্গিক। গম্ভীরার গানগুলি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার, দুর্নীতি, লিঙ্গ বৈষম্য, পরিবেশ দূষণ, স্বাস্থ্যঝুঁকি ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। গম্ভীরা গান কেবল ঐতিহ্যগত বিনোদন নয়, বরং জনগণকে তাদের অধিকার এবং ন্যায়ের জন্য সচেতন ও সক্রিয় করে তুলছে। তা গম্ভীরা তার নিজস্ব ছন্দেই প্রমাণ করে।

গম্ভীরা গানকে সমাজের চলমান অসঙ্গতি ও অন্যায় প্রকাশের হাতিয়ার হিসেবে দেখানো যায়। এতে জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, স্থানীয় সমাজ ও সাধারণ মানুষ—সকলের সচেতনতা ও দায়বোধের দিকে জোর দেওয়া হয়। গানটির সরল ভাষা ও প্রাণবন্ত অভিনয় জনগণের মনে গভীর প্রভাব ফেলে, যা প্রতিবাদকে দৃঢ় ও প্রাসঙ্গিক করে তোলে।

গম্ভীরার নাট্যধর্মী বিন্যাস—বিশেষ করে নানা ও নাতির সংলাপ—একে স্বতন্ত্র করেছে। নাতি চরিত্র সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে, যে তার জীবনের কষ্ট, দারিদ্র্য ও প্রশ্নগুলো উন্মুক্ত করে। নানা, যিনি কখনো শিব, কখনো কর্তৃত্বশীল ব্যক্তি বা প্রতীকী ক্ষমতার রূপ, সেগুলির উত্তর দেন। এই সংলাপে প্রকাশিত হয় ক্ষমতা ও

সাধারণ মানুষের টানাপোড়েন। সম্প্রতি মালদার সাহাপুর এলাকার বাবলু গম্ভীর দলের শিল্পীদের কণ্ঠে শোনা যায়—

"নানা হে, চাল নাই, ভাত নাই, কাজ নাই, কাম নাই, সংসার চলে কীভাবে?
নানা বলে— ট্যাক্স দিস যারে ভায়া; গিয়া পুছ তাহারে"

এই সরল কিন্তু ব্যঞ্জনাময় কথোপকথনে সমাজের বাস্তব সংকট ধরা পড়ে। রাষ্ট্র যে কাজ দিতে ব্যর্থ তার পরিষ্কার চিত্র ফুটে ওঠে। জনগণের নিজ অধিকার গান ও সংলাপ মিলিয়ে যে প্রতিফলন তৈরি হয়, তা মূলত জনগণ থেকে জনগণের উদ্দেশ্যে বার্তা পৌঁছে দেওয়া, আর এটাই তো গণমাধ্যমের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

গম্ভীরার ভাষা সরাসরি, সহজ ও লোকায়ত। এখানে কোনো জটিল অলংকার নেই, বরং ব্যবহার করা হয়েছে গ্রামের কথ্যভাষা। ফলে শিক্ষিত ও নিরক্ষর উভয় শ্রেণির মানুষই সমানভাবে এর বক্তব্য আত্মস্থ করতে পারে। এটি গ্রামীণ সমাজে তথ্য ও মতপ্রকাশের এমন এক মঞ্চ, যেখানে কোনো রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বা সেন্সরশিপ কাজ করে না। গবেষক গৌতমকুমার মণ্ডল লিখেছেন, "গম্ভীরার আসর ছিল গ্রামীণ সভা, যেখানে হাস্যকৌতুলের আড়ালে সমাজের প্রকৃত চিত্র উন্মোচিত হতো।" এভাবে গম্ভীরা বিকল্প গণমাধ্যমে পরিণত হয়েছে, যেখানে মানুষ শুধু বিনোদন পায় না, নিজেদের সমস্যাকেও উপলব্ধি করে।

গম্ভীরার গণতান্ত্রিক চরিত্র সবচেয়ে স্পষ্ট হয় যখন আমরা দেখি কীভাবে এটি গ্রামীণ মানুষকে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসে। সমাজের ক্ষমতার কাঠামোতে যারা প্রান্তিক, যাদের কণ্ঠস্বর উচ্চপর্যায়ে পৌঁছায় না, গম্ভীরায় তারা প্রধান চরিত্রে পরিণত হয়। হাস্যকৌতুল ও ব্যাঙ্গকৌতুকের মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবাদ অনেক সময়ই ছিল শাসকের বিরুদ্ধে একপ্রকার প্রতিরোধ। সরাসরি বিদ্রোহ সম্ভব ছিল না, কিন্তু কৌতুকের ছলে সেই প্রতিবাদ শোনা যেত। যেমন এক পুরনো গম্ভীরার পঙক্তি—

"দাদা, খাজনা বাড়ে, পেটে ভাত নাই,
কীসের স্বাধীনতা, বুঝি না হায়!"

এখানে সরাসরি রাষ্ট্রের সমালোচনা করা হয়েছে, কিন্তু তা এমন ভঙ্গিতে বলা হয়েছে যাতে প্রতিবাদী চেতনা ছড়িয়ে পড়লেও শাস্তির ভয় থাকে না।

এই ব্যাঙ্গকৌতুকই গম্ভীরাকে গণতান্ত্রিক স্বরে রূপান্তরিত করেছে। নারী-পুরুষ সমতা, সামাজিক ন্যায়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ—সবই গম্ভীরার মূল উপজীব্য হয়ে উঠেছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য গম্ভীরাকে অভিহিত করেছিলেন "উত্তরবঙ্গের জনজীবনের দলিল" বলে, কারণ এতে সমাজের সমস্যাগুলো এত নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যে এটি ইতিহাসের নথির মতোই গুরুত্বপূর্ণ। লোকজীবনের নানা অন্ধকার দিক, যেমন বাল্যবিবাহ, মদ্যপান বা কুসংস্কার, গম্ভীরার গানেই আলোচিত হয়েছে। ফলে গম্ভীরা গ্রামীণ সমাজে শুধু বিনোদন নয়, একপ্রকার রাজনৈতিক শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কারের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়।

স্বাধীনতার পর গম্ভীরার প্রভাব আরও প্রসারিত হয়। রাজনৈতিক দলগুলো দ্রুত বুঝে ফেলে, এই লোকশিল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছানো সবচেয়ে কার্যকর। নির্বাচনী প্রচারে গম্ভীরার গান ব্যবহার হতে থাকে। এতে গম্ভীরার পরিসর যেমন বাড়ে, তেমনি এর মৌলিক চরিত্রও পরিবর্তিত হতে শুরু করে। রেডিও ও পরে টেলিভিশনে গম্ভীরার অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু হয়। এভাবে গম্ভীরা লোকায়ত পরিসর ছেড়ে বৃহত্তর গণমাধ্যমের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে যায়। তবে এর ফলে অনেক সময় এর প্রতিবাদী ও স্বাধীন চরিত্র ক্ষীণ হয়। বাণিজ্যিকীকরণের কারণে গম্ভীরার মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাব প্রবেশ করে, যা সমালোচনার জন্ম দেয়।

তবুও গম্ভীরার প্রাণশক্তি টিকে থাকে। কারণ এর ভিত্তি মানুষের দৈনন্দিন জীবন, আর সেই জীবন যতদিন সমস্যায় জর্জরিত, ততদিন গম্ভীরাও বেঁচে থাকবে। আজকের গম্ভীরার পালায় দেখা যায় পরিবেশ সংকট, বেকারত্ব, শিক্ষার অভাব কিংবা রাজনৈতিক অস্থিরতার মতো নতুন নতুন বিষয়। যেমন সমসাময়িক এক গম্ভীরায় শোনা যায়—

“দাদা, নদী শুকায়, মাঠে ফসল নাই,
রাজনীতির দোষে গ্রাম যে মরুভূমি হয়।”

এখানে পরিষ্কার বোঝা যায় যে গম্ভীরা এখনও প্রাসঙ্গিক এবং জীবন্ত গণমাধ্যম হিসেবে কাজ করছে।

সমকালীন সমাজে গম্ভীরার প্রতিবাদী সুর আরও তীব্র ও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। আজকের দিনে এই গান কেবল লোকসংস্কৃতির ধারক নয়, বরং সমাজের নানা অসঙ্গতি, বৈষম্য এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠেছে। স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার দুরবস্থা ও দুর্নীতিকে লক্ষ করে গম্ভীরায় নানা চরিত্রটি আক্ষেপের সুরে বলে—

“হাসপাতালে গেছি রে ভাই, ডাক্তার নাই, ওষুধ নাই!
নার্স বলে, ‘সিস্টেমে দোষ’, তবু রোগী মরে যায়!”

এই গানটি কেবল স্বাস্থ্য খাতের ভঙ্গুর অবস্থাই নয়, বরং প্রশাসনিক উদাসীনতা এবং দুর্নীতির প্রতিফলনও তুলে ধরে।

একইভাবে নারী শিক্ষা ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও গম্ভীরায় গভীর প্রতিবাদ শোনা যায়। এক গানে নানা কন্যাশিক্ষার প্রতি সমাজের সংকীর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে বলে—

“মেয়েটি পড়ে ক্লাস টুয়েলভে, চায় হইতে ডাক্তার একদিন
পাড়ার লোক কয়, ‘বিয়াই দে, ঘরের কাজেই তো নারী বিন।”

এই গানটি স্পষ্ট করে দেয় যে সমাজ এখনও নারীর স্বপ্নকে গৃহকেন্দ্রিক ভূমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়।

তবে গম্ভীরা শুধু দুর্নীতি বা বৈষম্যের বিরুদ্ধে নয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষেও শক্তিশালী কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে। মালদার বহু গানে হিন্দু-মুসলিম সহাবস্থান এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিফলন দেখা যায়। যেমন মোথাবাড়ি

অঞ্চলের এক গানে নানা (হিন্দু) ও নাতি (মুসলিম) চরিত্রের কথোপকথনে সমাজের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা উঠে আসে—

"রোজ রোজ শুনি দাম বাড়ে, চাল ৭০, তেলও কাড়ে!
রোজা করি আমি ভাই, তোর পুজো আসে পিছে পিছে—
খালি পেটে ভগবান কি আসবে? না আল্লাহ, ও নানা?
ধর্মের আগে পেটই সত্য, বলো এইটাই মানা?"

এখানে স্পষ্ট হয় যে অভাব-অনটনের কাছে ধর্মীয় আচার গৌণ হয়ে গেছে। ধর্মের বিভাজন নয়, আসল সমস্যা হলো দারিদ্র্য ও দুরবস্থা।

ধর্মীয় উৎসব ও লোকসংস্কৃতির মেলবন্ধনেও গম্ভীরার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মালদার অনেক গ্রামে আজও দেখা যায় দুর্গাপূজার মঞ্চে মুসলিম শিল্পীরা গম্ভীরা পরিবেশন করছে, আবার মাজারের ওরসে হিন্দু শিল্পীরা ঢোল-বাদ্য সহযোগে অংশ নিচ্ছে। এই সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতিচ্ছবি সুন্দরভাবে ধরা পড়ে এক গম্ভীরা গানে—

"ও রে ভাই, আমি নাচি তোর পুজোতেও,
তুই আসিস আমার ঈদে।
শিব আর আল্লাহ নন আলাদা,
মনটা রাখ মানুষীদে।"

এই গানটি প্রমাণ করে যে গম্ভীরার মূল দর্শন হলো মানুষে মানুষে মিলন, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অটুট বার্তা।

আবার গম্ভীরার প্রতিবাদী কণ্ঠে কেমন আছো গর্জে উঠতে দেখা যায় ২০২৪ সালে ঘটে যাওয়া সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে। আরজি কর কলেজের অভয়া ধর্ষণকাণ্ড সারা দেশে আলোড়ন তুলেছিল। শাসকের চোখ রাঙানি ও রাজনৈতিক চাপে নীরব না থেকে মালদার ফতেপুর গম্ভীরা দল সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিবেশন করে, যেখানে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়।

নানা চরিত্রের সামনে নাতি কণ্ঠে ফুটে ওঠে জনমানসের ক্ষোভ—

"তুলে নিয়ে করল ধর্ষণ, হল রক্ত বর্ষণ রে (২)
কমাইতে চাইলে ধর্ষণ রোগ, ফাঁসি দাও মেয়েরে...
ঘরের লক্ষ্মী মেয়েকে তোরা রাখবি কেমন যতনে (২)
ও নানা হে, হে নানা, শুনো দুঃখের ঘটনা
ঘরের মেয়ে কাঁদছে কোনে, রাস্তা ঘাটে বইসা পিশাচ
দেখলে মেয়ের মাংস টানে
ও নানা হে... হে নানা... শুনো দুঃখের ঘটনা"

এই গান প্রমাণ করে যে গম্ভীরা শুধু লোকঐতিহ্যের অংশ নয়, বরং সমকালীন সমাজের অন্ধকারতম বাস্তবতাকেও নির্মোহ সাহসে প্রকাশ করার এক অনন্য মাধ্যম।

ফলে গম্ভীরা আজকের সমাজে দুর্নীতি, শিক্ষা বৈষম্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সমস্যাগুলিকে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করছে। এটি কেবলমাত্র লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক নয়, বরং সমকালীন সময়ের এক কার্যকর প্রতিবাদী মাধ্যম হিসেবেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

এই প্রসঙ্গে হরিদাস পালিত তাঁর 'আদ্যের গম্ভীরা' গ্রন্থে গম্ভীরার সামাজিক তাৎপর্য তুলে ধরে লিখেছেন—

"গম্ভীরা উৎসবের জন্য দেশের জনগণ দলবদ্ধ হইয়া একটি অনুষ্ঠানে অন্তরের সহিত যোগদান করিবার শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পল্লীবাসী একই কার্য্যের জন্য দলবদ্ধ হইতে শিক্ষা করিবার সুবিধা পায়।"

সবশেষে, গম্ভীরার সামগ্রিক ইতিহাস ও বর্তমান বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় এর অনন্য উত্তরাধিকার। শিবপূজার আচার থেকে শুরু করে পালাগান, সেখান থেকে সামাজিক প্রতিবাদ, এবং অবশেষে আধুনিক গণমাধ্যমে প্রবেশ—গম্ভীরার এই অভিযাত্রা এক চমকপ্রদ বিবর্তন। গণমাধ্যম গবেষণার দৃষ্টিতে এটি এক অনন্য উদাহরণ, যেখানে জনগণের স্বর জনগণের কাছেই ফিরে আসে, কোনো কর্পোরেট বা রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই। আজ যখন প্রচলিত সংবাদমাধ্যম প্রায়শই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত, তখন গম্ভীরার মতো লোকমাধ্যম আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে গণতন্ত্রের প্রকৃত শক্তি নিহিত থাকে জনগণের সরাসরি কণ্ঠে।

অতএব, গম্ভীরা কেবল লোকশিল্প নয়, বরং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির এক মূল্যবান ধারা। এর সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও, এর গভীর ঐতিহ্য ও সমাজের ভেতরে শিকড়বদ্ধ শক্তি একে এখনও প্রাসঙ্গিক করে রেখেছে।

তথ্যঋণ:

1. চৌধুরী, দুলাল, সম্পা. বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ। কলকাতা: অ্যাকাডেমি অব ফোকলোর। ২০০৪
2. ঘোষ, প্রদ্যোত। গম্ভীরা লোকসংগীত উৎসব: একাল ও সেকাল। কলকাতা: প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৯।
3. ঘোষ, প্রদ্যোত । লোকসংগীত: গম্ভীরা। কলকাতা: পুস্তক বিপনী, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ।
4. তরু, মাজহারুল ইসলাম, সম্পা. হাজার বছরের গম্ভীরা। ঢাকা: প্রতিভাস, ২৩ এপ্রিল ১৯৯৮।
5. পালিত, হরিদাস। আদ্যের গম্ভীরা। কলকাতা: প্রথম প্রকাশ, ১৯০৭।
6. ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলার লোকসাহিত্য। কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস। ১৯৩৩
7. রায়, পুষ্পজিৎ। গম্ভীরা। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র (ভারত), ২০০৯।
8. সেনগুপ্ত, পল্লব। লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ। কলকাতা: দেজ অফসেট, ডিসেম্বর ১৯৫৯।
9. Lambourn, G. E. Bengal District Gazetteers: Malda. Bengal Secretariat Book Depot, 1918.
10. World Press Freedom Index 2025. Reporters Without Borders, 2025. The Indian Express.
11. "Electoral Autocracy." Wikipedia, V-Dem Institute, 2024.
12. Freedom in the World 2024: Democracy Scores. Freedom House, 2024.
13. ফতেপুর গম্ভীরা দল। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার। বাবলু মন্ডল। সংগ্রহ: লক্ষ্মীকান্ত কর্মকার। জানুয়ারি, ২০২৫।